সাহিত্য

ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হয়ে গরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলা (অখণ্ড) ও বিহার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলা ও বিহার থেকে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। উচ্চবর্ণের হিন্দু শাসকদের প্রাণঘাতি হামলায় বৌদ্ধদের এই দশা হয়। রাজা শশাঙ্কও বাংলায় বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেন এবং বৌদ্ধের অনুসারিদের উপর নৃশংস হামলা চালান। আর এর ফলেই বাংলা প্রায় বৌদ্ধ শূণ্য হয়ে পড়ে এবং বৌদ্ধদের গড় ও মঠ, বৌদ্ধদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়। কোনও কোনও ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে কোনও প্রমাণ ছাড়াই এ জন্য পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকদের দায়ি করেন। যা ইতিহাসের আলোকে ভ্রান্ত বলে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা বলেছেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু রাজাদের অত্যাচারে বেশ কিছু বৌদ্ধ নেপালে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তাই বৌদ্ধ দোঁহা চর্যাপদ সেখান থেকেই উদ্ধার হয়েছে। লিখেছেন **মুহাম্মাদ আবদুল আলিম**

চর্যাপদের রচয়িতারা কেন হারিয়ে গেল?

বাংলা থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল যেভাবে

বাংলা ভাষার জনক ছিল বৌদ্ধরা। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এখনও বৌদ্ধদের নানা নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বহু বৌদ্ধবিহার এখনও বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান। অথচ আজ বাংলা সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ-শূন্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিপুলসংখ্যক বৌদ্ধ কোথায় হারিয়ে গেল?

বৌদ্ধ শাসনকাল ইতিহাসে পাল শাসনকাল নামে পরিচিত। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে পাল বংশের প্রথম শাসক গোপালের মাধ্যমে বৌদ্ধদের শাসনের সূত্রপাত হয় এবং স্থায়ী হয় চারশত বছর পর্যন্ত। এক সময় দক্ষিণ ভারত থেকে আগত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুসারী সেন রাজারা বাংলা আক্রমণ করেন এবং পাল রাজাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বাংলার গদিতে আসীন হন। সেন রাজারা বৌদ্ধদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা রীতিমতো বৌদ্ধ নির্যাতন শুরু করেন এবং বৌদ্ধ নিধনযজ্ঞ শুরু করেন। ফলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য বৌদ্ধদের একটা অংশ নেপালে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেজন্য চর্যাপদ নেপাল থেকেই আবিষ্কৃত হয়।

ষষ্ঠ শতকে যখন আরবে অন্ধকার যুগের যবনিকা বিদীর্ণ করে ইসলামের অভ্যুদয় হয়েছে, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে বাংলায় চলছিল বৌদ্ধ নিধন-যজ্ঞ। ৬০০ থেকে ৬৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার শৈব শাসক রাজা শশাঙ্ক বাংলা থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে উৎখাত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত গয়ার বোধিবৃক্ষ গুলি তিনি সমূলে উৎপাটন করেন। এই বৃক্ষগুলিকে বৌদ্ধ সম্রাট অশোক অসীম শ্রদ্ধা করতেন। সেই বৃক্ষগুলিকে রাজা শশাঙ্ক পত্র-পল্লব-মূল-কাণ্ড সবকিছু জ্বালিয়ে ছাই করে দেন। পাটলিপুত্রে (বর্তমান পটনা) গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্ন শোভিত প্রস্তর ভেঙে দিয়েছিলেন রাজা শশাঙ্ক। কুশিনগরের বৌদ্ধ বিহার থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়ন করেন। গয়ায় বৌদ্ধ মন্দিরে গৌতম বুদ্ধের যে মূর্তিটি স্থাপিত ছিল সেই মূর্তিটিকে উৎপাটিত করে সেখানে শিবের মূর্তি স্থাপন করেন। অক্সফোর্ডের Early History of India গ্রন্থে লেখা রয়েছে, রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ মঠগুলি ধ্বংস করে দিয়ে সেখান থেকে সন্ন্যাসীদের বিতাড়িত করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালের পাদদেশ পর্যন্ত বৌদ্ধ নিধন কার্যক্রম চালিয়েছিলেন কট্টর হিন্দু রাজা শশাঙ্ক। 'আর্যা মুখশ্রী মূলকল্প' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র বৌদ্ধ নয়, জৈন ধর্মের ওপরও উৎপীড়ন ও অত্যাচার সমানভাবে চালিয়েছিলেন তিনি।

বর্তমান যুগে বর্ণ সংস্কারে লালিত কিছু ব্যক্তি তাদের পূর্ব-পুরুষদের কৃতকর্ম মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য মুসলিমরা নাকি বৌদ্ধ বিতাড়ন ঘটিয়েছিল বাংলার মাটি থেকে। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি ১১০০ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি ধ্বংস করেছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তথ্য অনুসারে, বখতিয়ারের এই আক্রমণের সময়কাল ১১০০ খ্রিস্টাব্দ। অথচ স্যার উলসলি হেগ বলছেন, বখতিয়ার উদন্তপুরী আক্রমণ করেছেন ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে আর স্যার যদুনাথ সরকার এই আক্রমণের সময়কাল বলছেন ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ। বিদ্বেষীরা মুসলিম বিজেতাদের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য ইতিহাসের তথ্য বিকৃত করতেও কুণ্ঠিত নয়।

প্রকৃত ঘটনা হল— একজন ব্রাহ্মণ সম্রাট হর্ষবর্ধনকে হত্যা করে এবং তারপর সেই ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ক্ষমতা দখল করে। এই সময়েই ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে একদল চরমপন্থী বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ধর্মোন্মাদ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস ও ভস্মীভূত করে। বখতিয়ার খিলজি বৌদ্ধদের ওপর কোনও ধরনের নির্যাতন করেছেন— এমন তথ্য ইতিহাসে নেই, বরং বৌদ্ধদের আহ্বানে বঙ্গ বিজয়ের জন্য বখ তিয়ার খিলজি সেনা অভিযান পরিচালনা করেন। এমনকি বাংলা বিজয়ের পর তিনি বৌদ্ধদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় থেকে বিরত থাকেন।

ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বৌদ্ধদের উৎখাতের পর বহিরাগত আর্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভারতের মূল অধিবাসীদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও অপরাজেয় শক্তি হিসেবে মুসলমান শাসকদের উপস্থিতি তাদের স্বপ্নের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমান শাসকরা ব্রাহ্মণ সৃষ্ট বর্ণবাদের শিকার এদেশের অপামর জনসাধারণকে মুক্তির নিঃশ্বাস দিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আর্যশক্তি তার ক্ষত-বিক্ষত অস্তিত্ব কোনও মতে টালটামাল অবস্থায় ধরে রাখলেও বৃহত্তর পরিসরে কোথাও ধরে রাখতে পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত বাংলাই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির শক্তিশালী ঘাঁটি। সব শেষে বাংলা থেকে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির উৎখাত হয় তারপর তাদের প্রাধান্য বিস্তারে রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে।

টানা চারশো বছর বৌদ্ধরা বাংলা শাসন করেছিলেন। পুরো পাল যুগটাই ছিল বাংলার ইতিহাসে 'বৌদ্ধ যুগ'। আজও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বৌদ্ধ শাসনামলের নানা নিদর্শন দেখা যায়। বৌদ্ধদের পুরাতন অনেক বিহারের অস্তিত্ব আজও বাংলার মাটিতে বিদ্যমান রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় কিছু ধর্মীয় গান রচনা করেছিলেন, যেগুলো 'চর্যাপদ' নামে পরিচিত। চর্যাপদই হচ্ছে বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম নিদর্শন।

৭৫০ সালে পাল বংশের প্রথম রাজা গোপালের মাধ্যমে বৌদ্ধদের শাসন চারশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেন বংশের লোকেরা পালদের ক্ষমতাচ্যুত করে। দক্ষিণ ভারতীয় সেন শাসকেরা ক্ষমতায় এসে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। সেনরা ছিল ব্রাহ্মণ। সেন রাজাদের অত্যাচারে বৌদ্ধদের একটা অংশ নেপালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাধ্য হয়ে বৌদ্ধদের একটা অংশ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে বর্ণ প্রথার সর্বনিম্নে স্থান পায়। বৌদ্ধদের আরেকটি অংশ দিল্লির শাসক কুতুবুদ্দিন আইবেকের শরণাপন্ন হয় এবং বৌদ্ধদের রক্ষায় বাংলায় সেনাবাহিনী পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে। তিব্বতী বৌদ্ধ ঐতিহাসিক কুলাচার্য জ্ঞানানশ্রীর বিবরণী থেকে জানা যায়, মগধ থেকে একদল ভিক্ষু মির্জাপুরে গিয়ে বখতিয়ার খিলজির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে মগধকে মুক্ত করতে অনুরোধ করেন। (Journal of the Varendra Research Society, 1940). বৌদ্ধদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বখতিয়ার খিলজি তাঁর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ফলে ১২০৪ সালে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়।

এই প্রসঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'বৌদ্ধগণ এতটা উৎপীড়িত হইয়াছিল যে, তাহারা মুসলমানদের পূর্বকৃত শত অত্যাচার ভুলিয়া বিজয়ীগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ দলন এবং মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় ভগবানের দানস্বরূপ মনে করিয়াছিল। শূন্যপুরাণ-এ 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামক অধ্যায়ে দেখা যায় যে, তাহারা অর্থাৎ বৌদ্ধরা মুসলমানদিগকে ভগবানের এবং নানা দেবদেবীর অবতার মনে করিয়া তাহাদের কর্তৃক ব্রাহ্মণ দলনে নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছিল। ইতিহাসে কোথাও একথা নাই যে, সেনরাজত্বের ধ্বংসের প্রাক্কালে মুসলমানদিগের সঙ্গে বাঙালি জাতির রীতিমতো কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে। পরন্তু দেখা যায়, যে বঙ্গবিজয়ের পরে বিশেষ করিয়া উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণির হিন্দু নব ব্রাহ্মণদিগের ঘোর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে।' (ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, পৃষ্ঠা : ৫২৮)।

মুসলিম শাসকেরা বৌদ্ধদের প্রতি এতটাই উদার ব্যবহার করেছিলেন যে পাইকারী হারে বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখে ছেন, 'বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল।' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম, পৃষ্ঠা :১৩১)। তবে বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হওয়ার এই প্রক্রিয়াটি রাতারাতি সম্পন্ন হয়নি। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিকভাবে বৌদ্ধ ও মুসলিম সংমিশ্রণের ফলে বৌদ্ধরা ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন।

বখতিয়ার খিলজির বাংলা আক্রমণের আগেও নির্যাতিত বৌদ্ধদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন বাংলার মুসলিমরা এবং তাঁদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বৌদ্ধরা বখতিয়ার এবং তাঁর বাহিনীকে সাদরে বরণ করে নেন। স্থানীয় বৌদ্ধদের সমর্থন করেছিলেন বলেই মুসলিমরা এত সহজে বাংলা বিজয় করতে পেরেছিলেন। বৌদ্ধরা তাঁদের ধর্মের রীতি পালনের জন্য নেড়া হতেন সেজন্য তাঁদের কটাক্ষ করে 'নেড়ে' বলা হত। এই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হলে সেইসব ধর্মান্তরিত বৌদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদেরকেও 'নেড়ে' বলা হতে থাকে। এখনও কিছু উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সংকীর্ণমনা কিছু লোক মুসলমানদের 'নেড়ে' বলে কটাক্ষ করে।

যেসব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাংলায় থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা ভয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে 'শূদ্র' হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন। সাহিত্যিক আবদুস সাত্তার লেখেন: 'ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজির আগমনে এদেশের সাধারণ মানুষ উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। হোসেন শাহের বেলায়ও একই কথা।' বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর নির্যাতিত বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। চরম দুর্দিনে বৌদ্ধরা মুসলিমদের কাছে সাহায্য পেয়েছিল এবং মুসলিমদের সংস্পর্শে আসার সুযোগও পেয়েছিল; ফলে তারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দু ধর্ম থেকেও অনেকে বর্ণ বৈষম্যের শিকার হওয়ার কারণে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে।

ব্রিটিশ শাসনের সময় পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্ট ঐতিহাসিক ও পশ্চিমাদের পদলেহী কিছু কিছু দেশীয় ঐতিহাসিক মিথ্যা প্রচার করতে থাকে যে, মুসলমানদের সঙ্গে বৌদ্ধদের দ্বন্দ্বের কারণে বাংলা থেকে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী হারিয়ে গিয়েছে। প্রফেসর Johan Elverskog তাঁর Buddhism and Islam on the Silk Road বইয়ে ভারতে বৌদ্ধ-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে প্রচলিত এই মিথ্যাচারকে খণ্ডন করেছেন। বৌদ্ধদের উপর মুসলিম সেনাপতি ও শাসকগণ অত্যাচার করেছেন--- এই ধারণাকে তিনি নাকচ করে দেন। তিনি লিখেছেন, বৌদ্ধদের সঙ্গে মুসলমানদের শত্রুতার প্রচলিত ধারণা পশ্চিমে তৈরি হয় এবং এটা আরও প্রতিষ্ঠিত হয় তালিবান কর্তৃক ২০০১ সালে (আফগানিস্তানের বামিয়ানে) বিশাল বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের মাধ্যমে। তবে বাংলার মুসলমানদের বড় অংশই বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে (দেখুন— The Rise and Fall of Buddhism in South Asia, London, 2008)।

সাহিত্য-সংস্কৃতি

বিশ্বেশ্বরপুরে বেগম রোকেয়া উৎসব

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে টানা ৩ দিন ব্যাপী বেগম রোকেয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মগরাহাট থানার বিশ্বেশ্বরপুরে। পঞ্চম বার্ষিকী উৎসবে সমাজসেবা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বেগম রোকেয়া স্মারক সম্মাননা ২০২২' প্রদান করা হয় সেখ ইনসুর আলি, সেকেন্দার আলি সেখ, আসিয়া বেগম ও সেখ বাউজুল হোসেনকে। পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি ছিল মুমূর্ষ রোগীদের সাহায্যার্থে রক্তদান শিবির, বার্ষিক ক্রীড়া, গজল প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রাপকদের হাতে স্মারক সম্মাননা তুলে দেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন নূরনবী জমাদার, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ডলি প্রামানিক, উপপ্রধান জায়েদা মোল্লা, বিশ্বেশ্বরপুর বেগম রোকেয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক সাহাজুদ্দিন মোল্লা, সভাপতি কাইয়ুম মোল্লা, মেজবাহাদুর মল্লিক, হাবিবা মোল্লা, মহিবুর রহমান মোল্লা, নাসির উদ্দিন মোল্লা ও নন্দন নার্সারি কেজি স্কুলের সম্পাদক আব্দুল আলিম মোল্লা প্রমূখ।

—আজিজুল হক

অন্তরীণ সাহিত্য অনুশীলনের কবি সম্মেলন

যুথিকা সাহিত্য পত্রিকার দফতরে সুভাষচন্দ্র নাগ স্মৃতি সভাহলে অন্তরীণের কবি সম্মেলন ২০২২ অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। সাহিত্য বন্ধু সোমনাথ নাগের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববঙ্গ বাংলা সাহিত্য অ্যাকাডেমি অনুমোদিত অন্তরীণ সাহিত্য অনুশীলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ১৮ জন কবি-সাহিত্যিককে স্বর্গীয় নন্দলাল দাস স্মৃতি সাহিত্য সম্মাননা-২০২২ প্রদান করা হয়। উপস্থিত সকল কবি স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন, তাদের হাতে পদক , শংসাপত্র ও পত্রিকা তুলে দেওয়া হয়। অন্তরীণ সাহিত্য অনুশীলনের মুখপত্র অন্তরীণ সাহিত্য পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন-সহ বাংলাদেশের কবি দয়াল ফারুকের কাব্যগ্রন্থ যুগের জানোয়ার, আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি কবি শিবানী বিশ্বাসের পরশন ও বসন্তোত্তর নবরাগ নামে দু'টি কাব্যগ্রন্থ এবং কবি কালীপদ সর্দারের নাট্যকাব্য চিত্রলেখার দাবি প্রকাশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন– বিশ্ববঙ্গ বাংলা সাহিত্য অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান ও পরমাণু কাব্যের উদ্ভাবক কবি সোমনাথ নাগ, কবি সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি দেবপ্রসাদ বসু, অন্তরীণ-এর সম্পাদিকা স্বপ্না মুদি প্রমুখ।

এ সপ্তাহের কবিতা

অন্য আমি

খোদেজা খাতুন

আমার ভেতর থেকে আর একটা অন্য আমি
বেরিয়ে এসে শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে হাঁটতে থাকে
শপথ নিয়েছে সে উড়ে যাবে,
উড়তে উড়তে মেঘকে ধরে ফেলবেই,
তার মাথায় পা রাখতেই ঝরে পড়বে বৃষ্টি।
আমার ভেতর থেকে একটা অন্য আমি
বেরিয়ে এসে আমাকে শাসায়,
আমার অতীতকে সামনে এনে ভাবতে বলে।

সামান্য আলোর রেখা

কামাল চৌধুরী

সামান্য আলোর রেখা, এই নিয়ে আশ্চর্য এপথে
পেরিয়েছি অফুরন্ত নদীজল তীব্র জোছনায়
আমাকে যে ডেকে নিল মধ্যরাতে ধীবরের রথে
অস্পষ্ট, দেখি না তাকে; পলাতক, মৃদু কুয়াশায়
যে গান শোনায় রাত্রি, তার সুরে স্রোত অবিরল
সেখানে বিহঙ্গ ডাকে, কারা ডাকে, পথিক উদাস
ঠিকানা ঘুমন্ত গ্রাম, গাঙে তবু উজানের জল
আমিও মাটির পুত্র, মাছভাতে করি বসবাস
যে শরীর জলে ভেজা, তার মধুচন্দ্রিমার ঢেউ
খোলা আকাশের নিচে পাল তোলা হাওয়ায় উতল
সেখানে আশ্চর্য শুনি স্নানরতা অলৌকিক কেউ
আমাকেই পাঠ করে, পাঠ করে ধ্রুপদের জল
এভাবেই প্রকাশিত, এভাবেই খাতা খুলে রাখি
উন্মাদ রাত্রির পাশে থাকি আমি, এভাবেই থাকি।

ধর্মগ্রন্থ

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

তুমি আমার কাছে এতদিন ছিলে
প্রাচীন লুপ্তপ্রায় আরবীয় সেমেটিক ধর্মগ্রন্থ,
কিন্তু যেদিন তোমার উপর মুদ্রিত অক্ষর পাঠোদ্ধার করলাম
সেদিন দেখি তুমি এক পৌরাণিক প্যাগান দেবী,
এ সংঘাত কিভাবে সইব আমি?
একদিকে তোমার লোভনীয় শরীর দেবীর মত,
অপরদিকে আমি একেশ্বরবাদের পূজারী
একাত্মবাদের কলমা উচ্ছাসিত হচ্ছে আমার হৃদয়ে,
কান পেতে আছি তোমার বুকে,
শুনতে পাই অজস্র ঈশ্বরের আর্তনাদ,
শতাব্দী প্রাচীন শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে তোমার মধ্যে,
তাই অনেক ভাবনাচিন্তা করে
ধর্মগ্রন্থের পৃষ্ঠা বন্ধ করে দিলাম,
যদি অবিশ্বাসী হয়ে যায় সেই ভয়ে।

বিরহ হরিণাসু

অনিরুদ্ধ আলম

দিলে শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা কিংবা নিদাঘ ক্ষণ
ডাহুকের ডাকে উন্মুখ হই। নদী আরও কাছে আসে
এ হৃদে হরিণা বেদনা উজায় ভালো-লাগা আলাপন
বিরহের বুকে মুখ গুঁজে বলি, 'থেকো খুব পাশেপাশে!'

প্রতিশ্রুতি

ড. রতন ভট্টাচার্য

বসন্ত দরোজা ভেঙে নিয়ে আসবে সবুজ,
অনেক দিন গৃহবন্দি, আমি গাছ হতে চেয়েছিলাম,
অজস্র বন্ধু হাওয়া ছড়াবার প্রতিশ্রুতি ছিল,
অলস আবেগে। মিথ্যে ভ্যাকসিন,
মিথ্যে ভেন্টিলেশন আর মিথ্যে হাসপাতাল
বিল আবার সেই চতুর্থ ঢেউ
জানালার ওপারে উঁকি দেয়।
তবু আমার শিরায় কবিতার প্লাবন,
মনে হয় অবশেষে আমি গাছ হতে পেরেছি,
সবুজের গন্ধে ম' ম' চারিদিক।

পদ্য লিখে

জাহাঙ্গীর মিদ্দে

পদ্য লিখে কি হয়, পয়সা থাকতে হবে
কদর হবে, সভা সমিতির মঞ্চে আসন পাবে
প্রধান অতিথি, সভাপতি, নয়ত বিশেষ অতিথি।
ঘরে বসে বসে কল্পনা ও কঠিন বাস্তবের জালে
যে লাইন তুমি তুলে আনো, তার স্বাদ ইলিশ মাছের মত
যেমন খেতে তেমন শুঁকতে,
তবু মাংসাশীরা মাছের স্বাদ অতশত বোঝে না।
পদ্য লিখে কি হয়, পয়সা থাকতে হবে
দেখবে লোকে সেলাম দেবে, লাল সেলাম, সবুজ সেলাম
তুমি হয়ত তোমার পদ্যে যাপিত জীবনের সমস্যা
টানাপোড়েনের কথা বলো, ক্ষয় মেরামতের কথা বলো
খোঁচা খাওয়া ঘা শুকানোর কথা বলো নির্দিষ্ট মলমে
তবু, তোমার দিক নির্দেশের মান মর্যাদা কে দেয়?
প্রতি একশোয় হয়ত পাঁচজন পদ্য খাদক আছে
কয়েক ছটাক করে মর্যাদা তারা দেয়, সোহাগী স্বাদে
তারা দাঁতে কাটে, জিভে চোষে, চিবোয় তোমার
হৃদয় থেকে উৎসারিত অনির্বচনীয় লাইন।

সেকালের কিছু মুসলিম পত্রপত্রিকা (১৮৮৯-১৯১৭)

দেখা গেছে, অবিভক্ত বাংলায় বাংলাভাষী মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কলকাতা থেকে যেসমস্ত পত্র-পত্রিকা বের হত, তাতে মুসলিম লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। এছাড়া সেই সময় মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক এইসব পত্র-পত্রিকায় মুসলিমদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবও প্রকটিত হত। তাই ১৮৮৯-১৯১৭'র মধ্যে মুসলিমরা বেশ কিছু পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। বেশির ভাগ পত্রিকার জীবনকাল খুব বেশিদিন না হলেও এই পত্রিকাগুলি বাংলাভাষী মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্ম চর্চা, সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশ, সাহিত্য চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। সেকালের এই পত্র-পত্রিকাগুলির ভূমিকা ও অর্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন **ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান**

পূর্ব প্রকাশিতের পর

হে দয়াময়। আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে বিদযার চর্চ্চা ও বিদ্যোৎসাহী হইতে বঞ্চিত করিও না। কারণ বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর আলস্য শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অচিরে তাঁহারা যে একেবারে ধ্বংসসাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সময় থাকিতে যদি তাঁহাদিগকে ভোগবিলাসরূপ ঘোর নিদ্রা হইতে জাগরিত না করা হয়, তাহা হইলে তোমার পবিত্র মনোনীত ধর্ম্মের উপাসকমণ্ডলীর অনুদিন কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা তুমি বই আর কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা নাই। হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন। হাফেজ সেই ভোগবিলাস সুখাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্ম্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র রীতি নীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য তোমারই আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে আজ বঙ্গের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইল। তুমিই হাফেজের একমাত্র বল ও সহায়।'

'মিহির' এবং 'হাফেজ' এ দু'টি পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। এবং উভয় পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল 'আভাস'। কিন্তু প্রথম 'আভাসে'র সঙ্গে দ্বিতীয় 'আভাসে'র পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। সময়ের দিক দিয়ে দু'টি পত্রিকার ব্যবধান মাত্র পাঁচ বছরের। 'মিহির' পত্রিকার মাধ্যমে বিচিত্র সাহিত্য চর্চার যে উচ্চাভিলাষ ব্যক্ত হয়েছিল তা 'হাফেজের' মধ্যে যেন বিশিষ্ট এবং সংকুচিত হয়ে দেখা দিয়েছিল। হয়ত পত্রিকাটিকে 'সকলের হৃদয়গ্রাহী' করার জন্যই এ পন্থা অবলম্বন করা হয়।

বস্তুতঃপক্ষে 'নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্ম্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত

RAJA BAHADUR'S LIBRARY
MUKTAGACHHA
এস্লাম তত্ত্ব
বা
মোসলমান ধর্ম্মের সার সংগ্রহ।

করিবার জন্যই একালের অধিকাংশ মুসলিম পত্রিকাগুলোর প্রকাশ ঘটে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয় দশকের অধিকাংশ মুসলমান সাহিত্যিকগণের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলেও ঐ এক প্রেরণা দেখা যায়। সমাজকে জাগানোর প্রেরণা তাঁরা সন্ধান করেছিলেন ইসলাম ধর্ম্ম ও ইতিহাসের মধ্যেই। তাঁদের লেখনী প্রধানতঃ পরিচালিত হয়েছিল ঐ পথেই এবং তারই ফলে আমরা পেয়েছি— তাপস কাহিনী, পান্দেনামা, ইসলাম ইতিবৃত্ত, স্পেন বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ।

প্রথম সংখ্যা 'হাফেজে' সম্পাদক বলেছেন-— 'আমাদের মধ্যে এই একখানি মাত্র মাসিক পত্রিকা, ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্বকল্পে বঙ্গীয় প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতার প্রাণপণে সাহায্য করা কি উচিত নহে?' সম্পাদকের উক্তি থেকে মনে হয় 'হাফেজ' তখন বাংলার মুসলমান পরিচালিত একমাত্র মাসিক পত্র ছিল। এর আগে 'মিহির' 'সুধাকরে'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'মিহির ও সুধাকর' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'ইসলাম প্রচারক' বেরিয়ে দু'বছর চলার পর বহুকাল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই 'হাফেজে'র প্রকাশ ঘটেছিল মুসলমানদের একমাত্র সাহিত্য পত্রিকারূপে।

পত্রিকার আনুকূল্যের জন্য মুসলমান সমাজের প্রতি সম্পাদকের আবেদন আশানুরূপ ফল সৃষ্টি করেছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় সংখ্যায় 'হাফেজের বিরাট উপহার' শীর্ষক এক বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, 'আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকের এককালীন ৩ টাকা বা ৩ টাকা ৮ আনা দেওয়া কষ্টকর বলিয়া আমরা বৎসরের মধ্যে ৩ বারে ৩ টাকা লইতে স্বীকৃত আছি। কিন্তু প্রত্যেকবারে উপহার দেওয়া হইবে। তজ্জন্য ডাক মাশুল ৪ আনা বেশি লওয়া হইবে।'

''প্রথমবারে নামাজতত্ত্ব ও সুরিয়া বিজয় উপহার দিয়া ১ টাকা ৪ আনা আদায় করা হইবে। তৎপরে অন্যান্য উপহার দিয়া টাকা আদায় করা হইবে। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণ সত্ত্বর অগ্রসর হউন।''

পত্রিকার লেখক প্রধানতঃ ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন, কবিবর মুন্সী মোজাম্মেল হক, কবি কায়কোবাদ, মৌলভী মহম্মদ ইয়াকুব, শেখ ওসমান আলী, বি. এল. এবং সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম সাহেব। প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই একজন লেখকের একাধিক লেখা ছাপা হ'ত। তখনকার দিনে লেখকের অভাবই ছিল এর প্রধান কারণ। 'হাফেজ' পত্রিকায় হিন্দু লেখকের কোনও লেখা দেখা যায় না।

প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন, পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনী, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতির মধ্যে তারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। 'সভ্যতার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা', 'শাহনামা', 'মুসলমানের গতকালীন শিক্ষা', 'মুসলমানের সাহিত্যে আধিপত্য', 'ইসলামে বিদ্যার গৌরব', 'মামুনের সময় বিজ্ঞান চর্চ্চা' প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং 'রমজান', 'আদর্শ প্রেমিক' প্রভৃতি কবিতায় মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস, মুসলিম সাধকগণের ধর্ম্মভক্তি, ইসলাম ধর্ম্মের বিধি-বিধান ও সুমহান শিক্ষাকে প্রকটিত করার চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। লেখাগুলো থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

ক্রমশ...

(বানান অপরিবর্তিত)